গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ২৭ সংখ্যা | ২৩ - ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

ভোট-রাজনীতির পাঁকে ভারতরত্ন

একেবারে পাইকারি হারে। হ্যাঁ, ভারতরত্ন খেতাবের কথাই বলছি।

মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে দু-দফায় পাঁচজনকে দেওয়া হল এই খেতাব। লালকৃষ্ণ আদবানি, নরসিমা রাও, চৌধরী চরণ সিং, কর্পূরী ঠাকুর এবং এম এস স্বামীনাথন। এর মধ্যে তিনজনকে দেওয়া হয়েছে মরণোত্তর।

একটা দেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান যে এমন হারে দেওয়া যেতে পারে, সম্মানটিকে এমন করে সঙ্কীর্ণ রাজনীতির বিষয় করে তোলা যেতে পারে এবং জনমানসে তার মর্যাদাকে এমন করে ধুলোয় লুটিয়ে দেওয়া যেতে পারে তা বোধহয় নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী না হলে বোঝা যেত না। কোনও শাসক যখন এমন একটি খেতাবকে ক্ষমতার হাতিয়ার করে নেন, তখনই একমাত্র এমন ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটাতে পারেন। তখন আর চক্ষুলজ্জাটুকুও অবশিষ্ট থাকে না।

ভারতরত্নের মতো দেশের সর্বোচ্চ সম্মান পাওয়ার যোগ্যতা কী হতে পারে? সাধারণ ভাবে যিনি সমাজের জন্য, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কল্যাণের জন্য এমন বিশেষ কিছু করেছেন যা বিরল, যা সমাজকে, সভ্যতাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। অর্থাৎ যাঁকে এই সম্মান দেওয়া হবে তাতে তিনি যেমন সম্মানিত হবেন, ঠিক তেমনই দেশের মানুষও তাঁকে এই সম্মান জানানোর মধ্য দিয়ে নিজেদের সম্মানিত মনে করবেন। এই নিরিখেই কি কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এই পাঁচজনকে ভারতরত্নে সম্মানিত করল?

দুয়ের পাতায় দেখুন

কেন্দ্র ও রাজ্যের অপশাসনের বিরুদ্ধে

৬ মার্চ রাজ্যের সর্বত্র গণবিক্ষোভ

সংসদীয় ব্যবস্থা, না কেনাবেচার বাজার?

এক একটা ভোটপর্ব যায়, তাতে কত টাকা ওড়ে? কত কোটি তা হিসাব করতে গেলে রামা কৈবর্ত-রহিম শেখদের মাথা ঘুরে যায়। নানা রঙের ঝান্ডাধারী বড় বড় দল এত টাকা কোথায় পায়, কে দেয়? কেনই বা দেয়? উত্তরটা জানা— দেয় বড় বড় পুঁজিমালিকরা। দলের তহবিলে এই টাকা পাওয়ার একটা রাজপথ ২০১৭-তে তৈরি করেছিল কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার। তার নাম ইলেক্টোরাল বন্ড, বা নির্বাচনী বন্ড।

নির্বাচনী বন্ড

পুঁজি মালিকরা কেন গদিতে থাকা বা গদিতে যেতে পারে এমন দলের তহবিলে টাকা ঢালে? এর উত্তরও দেশের মানুষের কাছে একেবারে অজানা নয়। এবারে দেখা গেল ১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনী বন্ডকে অসাংবিধানিক বলে রায় দিতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ বলেছে, এই নির্বাচনী বন্ড হল কোনও কিছুর বিনিময়ে কাউকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা, আদালতের ভাষায় 'কুইড প্রো কুয়ো'।

এই বন্ডের ইতিহাসটা একটু দেখে নেওয়া যাক। ২০১৭-র মাঝামাঝি কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার নির্বাচনে কালো টাকা রুখবার কথা বলে জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, আয়কর আইন, কোম্পানি আইনের সংশোধনীর মাধ্যমে এই নির্বাচনী বন্ড চালুর আইন এনেছিল। তৎকালীন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিচালকরা এবং নির্বাচন কমিশনের কর্তারা এর বিরুদ্ধে মত দেন। তাঁরা বলেন, এর ফলে নির্বাচনে খাটা টাকা নিয়ে অস্বচ্ছতা আরও বাড়বে। কিন্তু ২০১৮-র শুরুতেই নরেন্দ্র মোদি সরকার সব আপত্তি উড়িয়ে বন্ড চালু করে দেয়। এর মাধ্যমে কোনও ব্যক্তি বা কর্পোরেট সংস্থা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া থেকে যত খুশি ১ হাজার থেকে ১ কোটি টাকা মূল্যের বন্ড কিনে কোনও রাজনৈতিক দলের হাতে তা তুলে দিতে পারেন। কে টাকা দিলেন তাঁর পরিচয় রাজনৈতিক দলটি ছাড়া কেউ জানবে না। রাজনৈতিক দলটিও প্রাপ্ত বন্ডের কোনও রেকর্ড রাখতে বাধ্য থাকবে না। দাতা এর জন্য আয়করে ছাড় পাবেন।

কারা পেল, কে দিল

২০১৮ থেকে ২০২৩-এর মার্চ পর্যন্ত ১২ হাজার ৮ কোটি টাকা নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলি পেয়েছে। এর ৫৫ শতাংশ অর্থাৎ ৬ হাজার ৫৬৪ কোটি টাকা পেয়েছে একা বিজেপি। কংগ্রেস পেয়েছে ১ হাজার ১৩৫ কোটি টাকা, তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে ১ হাজার ৯৩ কোটি টাকা (দ্য ওয়্যার ও ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ১৬.০২.২০২৪)। অন্যান্য যারা বেশি টাকা পেয়েছে তাদের মধ্যে আছে বিজেডি, ডিএমকে, বিআরএস, ওয়াইএসআর কংগ্রেস, আপ, টিডিপি, শিব সেনা ইত্যাদি।

কে দিল? সাধারণ মানুষের পক্ষে জানা কঠিন। এমনকি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে স্টেট ব্যাঙ্ক যদি ৬ মার্চের মধ্যে

ছয়ের পাতায় দেখুন

সরকারকে কড়া হুঁশিয়ারি গ্রামীণ ভারত বনধ ও শিল্প ধর্মঘটে

সংযুক্ত কিসান মোর্চা (এসকেএম) এবং কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলির ডাকে ১৬ ফেব্রুয়ারি দেশ জুড়ে পালিত হল গ্রামীণ ভারত বনধ ও শিল্প ধর্মঘট। এ রাজ্যে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা থাকায় ওই দিন এসকেএম গ্রামবাংলায় প্রতিবাদ দিবস পালন করে এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলো ১৩ ফেব্রুয়ারি জেলায় জেলায় আইন অমান্য, মিছিল, বিক্ষোভ ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করে।

ফসলের এমএসপি আইনসঙ্গত করা, নয়া বিদ্যুৎ আইন ও স্মার্ট মিটার বাতিল করা, চারটি কালা শ্রম কোড বাতিল করা, খেতমজুর সহ সমস্ত গ্রামীণ মজুরদের সারা বছরের কাজ ও ৬০০ টাকা মজুরি, জবকার্ড হোল্ডারদের বকেয়া মজুরি অবিলম্বে পরিশোধ করার দাবিতেই ছিল এই আন্দোলন।

বনধের সমর্থনে বিহারের পাটনায় মিছিল। ১৬ ফেব্রুয়ারি

অভিনন্দন এআইইউটিইউসি-র

১৬ ফেব্রুয়ারি দেশ জুড়ে শিল্প ক্ষেত্রে এবং গ্রামীণ ক্ষেত্রে বনধ সফল করার জন্য দেশবাসীকে অভিনন্দন জানিয়ে এ আই ইউ টি ইউ সি-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর দাশগুপ্ত ওই দিন এক বিবৃতিতে বলেন, দেশের নানা প্রান্তে আন্দোলনকারীদের উপর নৃশংস পুলিশি আক্রমণ ও গ্রেপ্তারের আমরা তীব্র নিন্দা করছি।

আমরা তঁদের দ্রুত মুক্তি দাবি করছি। উল্লেখ্য, গ্রেপ্তার হওয়া আন্দোলনকারীদের মধ্যে রয়েছেন এআইইউটিইউসি-র অল ইন্ডিয়া ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য এবং সংগঠনের হরিয়ানা রাজ্য সভাপতি কমরেড রাজেন্দ্র সিংহ-ও।

অল ইন্ডিয়া কিসান খেতমজদুর সংগঠন (এআইকেকেএমএস) রাজ্যের দুই শতাধিক জায়গায় কৃষক-খেতমজুরদের সংগঠিত করে এসকেএম-এর ব্যানারে বিক্ষোভ মিছিল, সভা, কুশপুতুল দাহ ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করে। হাজার হাজার কৃষক-খেতমজুর এবং শ্রমিক এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন। পাঞ্জাবের কৃষকরা এই দাবিতে আন্দোলন করছে। দিল্লি সীমান্তে এই কৃষকদের উপর মোদি সরকার ড্রোন থেকে টিয়ার গ্যাস, রবার বুলেট ছুড়ে যে ভাবে বর্বর আক্রমণ করেছে সর্বত্র তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়েছে।

মোদি সরকার দেশের শ্রমিক-কৃষক সহ আমজনতার বিরুদ্ধে একটার পর একটা যে নীতি গ্রহণ করে চলেছে তা প্রতিরোধে শ্রমিক-কৃষকের এই যৌথ মঞ্চ গোটা দেশব্যাপী আন্দোলনের আহ্বান জানিয়েছে।

ভোট রাজনীতির পাঁকে ভারতরত্ন

একের পাতার পর

বিজেপির মার্গদর্শকমণ্ডলীর অন্যতম লালকৃষ্ণ আদবানির কথাই ধরা যাক। তাঁকে যে ভারতরত্ন দেওয়া হল, তা দেশ ও সমাজের প্রতি তাঁর কোন কল্যাণকর কাজের জন্য? না, তেমন কোনও যোগ্যতার কথা সরকার বা বিজেপি নেতারা বলতে পারেননি। তা হলে তাঁকে তা দেওয়া হল কেন?

অনেকেরই মনে আছে, কংগ্রেস নেতা তথা প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর উদ্যোগে টিভিতে রামায়ণ-মহাভারত দেখানো শুরু হলে দেশ জুড়ে বিরাট অংশের মানুষের মধ্যে হিন্দুত্বের আবেগ তৈরি হয়। এই আবেগকে কংগ্রেস হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে আত্মসাৎ করতে পারে, এক দিকে এই আশঙ্কা, অন্য দিকে ভিপি সিংয়ের মণ্ডল রাজনীতি যে ভাবে রাজ্যে রাজ্যে জাতপাতের রাজনীতি চাগিয়ে তোলে তার পাল্টা, জাতপাত নির্বিশেষে গোটা হিন্দু ভোটব্যাঙ্ককে এককাট্টা করতে আদবানি নেমে পড়েন রামজন্মভূমি আন্দোলনে এবং শুরু করেন রথযাত্রা। পরিণতিতে যেমন দেশের নানা জায়গায় দাঙ্গা বাধে, তেমনই বিজেপি-আরএসএস দুষ্কৃতী বাহিনী পাঁচশো বছরের পুরনো বাবরি মসজিদ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। তার অভিঘাতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কয়েক দিনের মধ্যে হাজারের বেশি মানুষের প্রাণ যায়। এই গোটা কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে ভারতের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের ভিতটিই নড়ে ওঠে। মুসলিমদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক প্রতিপন্ন করে দেওয়া হয়। এর মধ্য দিয়ে হিন্দুত্ববাদের যে ঢেউ ওঠে তাতে চড়েই ক্ষমতার গদিতে পৌঁছে যান বিজেপি নেতারা। আবার ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজি এই সুযোগটিকে কাজে লাগিয়ে উদারিকরণের নামে বেপরোয়া ভাবে বেসরকারিকরণের খাঁড়া নামিয়ে আনে দেশের শ্রমজীবী মানুষের উপর। সম্প্রতি সেই বাবরি মসজিদের জায়গাতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রামমন্দিরের উদ্বোধন করে হিন্দু-মসীহা সাজলেন। এই সার্বিক সাফল্যের স্বীকৃতি হিসাবেই রামজন্মভূমি আন্দোলন ও রথযাত্রার প্রাণপুরুষ লালকৃষ্ণ আদবানির ভারতরত্ন খেতাব। এই খেতাবের সঙ্গে দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থের, কল্যাণের, জীবনমানের অগ্রগতির কী সম্পর্ক?

বিস্মৃতপ্রায় কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাওকে কোন যোগ্যতার ভিত্তিতে ভারতরত্ন দিলেন প্রধানমন্ত্রী? নরসিমা রাওই নেহেরু পরিবারের বাইরে প্রথম কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী। নানা কারণে নেহেরু পরিবারের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব আজ সকলের জানা। সেই দূরত্বকে দক্ষিণী এই নেতার প্রতি কংগ্রেসের অবহেলার ফল হিসাবে দেখিয়ে দক্ষিণ ভারতে, বিশেষত তেলঙ্গানায় বিজেপির প্রভাব বাড়াতেই যে এই পুরস্কার, তা বুঝতে কারও বাকি নেই। দেখা যাক, নরসিমা রাওয়ের কৃতিত্বগুলির কোনও একটিও তাঁকে ভারতরত্নে উত্তীর্ণ করতে পারে কি না।

ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর দিল্লিতে ১৯৮৪-র শিখ বিরোধী দাঙ্গায় প্রায় তিন হাজার শিখ ধর্মাবলম্বী মানুষ নিহত হন। সেই সময়ে কেন্দ্রে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন নরসিমা রাও। দাঙ্গার সময়ে দিল্লি পুলিশ যে তা থামানোর কোনও চেষ্টা না করে হাত গুটিয়ে বসেছিল, তা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশেই বলে সেই সময়ে নানা মহল থেকে অভিযোগ উঠেছিল। রাওয়ের কৃতিত্বের মুকুটে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পালকটি তাঁর প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন। প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও চাইলেই সেদিন পুলিশ দিয়ে, সেনা নামিয়ে বিজেপি-আরএসএস দুষ্কৃতীদের বাবরি মসজিদ ভাঙা আটকাতে পারতেন। কিন্তু এ বারও তিনি হাত গুটিয়ে বসে থেকে এ যুগের সবচেয়ে লজ্জাজনক কাজটি ঘটতে সাহায্যই করেছিলেন।

দুর্নীতির ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নাকি জিরো টলারেন্স! তিনি নাকি দুর্নীতি দেখতেই পারেন না! তাঁর ঘনিষ্ঠ ধনকুবের গৌতম আদানিদের দুর্নীতি হয়তো কোনও কারণে তাঁর চোখে পড়ে না। কিন্তু নরসিমা রাওয়ের দুর্নীতিগুলি নরেন্দ্র মোদির চোখ এড়িয়ে গেল কী করে! কুখ্যাত গডম্যান চন্দ্রস্বামীর সঙ্গে নরসিমা রাওয়ের ঘনিষ্ঠতা, হর্ষদ মেহতার দাবি মতো তাঁর থেকে ১ কোটি টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ, হাওলা কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার অভিযোগে তাঁর তিন বছরের জেল হওয়ার মতো ঘটনাগুলিকে নরেন্দ্র মোদি কোন সুনীতি ঠাওরে তাঁকে দেশের 'রত্ন' বলে ঘোষণা করে দিলেন?

সব মিলিয়ে কংগ্রেসের উপর চাপ তৈরি করা এবং দক্ষিণ ভারতে বিজেপিকে প্রাসঙ্গিক করে তোলা ছাড়া এই ভারতরত্নের আর কোনও কার্যকারিতা অন্তত দেশের শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের কাছে নেই। বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কর্পূরী ঠাকুর প্রায় বিস্মৃতিতে চলে গিয়েছিলেন। মণ্ডল আন্দোলনেরও আগে বিহারের অনগ্রসরদের জন্য সংরক্ষণের বন্দোবস্ত করেছিলেন তিনি। আজ যখন বিহার সরকারের পক্ষ থেকে জাতগণনা করে নতুন করে জাতভিত্তিক সংরক্ষণের দাবি উঠেছে, ভোটরাজনীতিতে তাতেই খানিক কোণঠাসা হয়ে ওবিসি ভোট নিজেদের দিকে টানতে কর্পূরী ঠাকুরের শরণাপন্ন হল বিজেপি। ঠিক যেমন বিস্মৃতপ্রায় কৃষকনেতা চৌধরী চরণ সিংকে ভারতরত্ন দেওয়ার মধ্য দিয়ে পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের ২৯টি লোকসভার আসনের এলাকার জাঠ ভোট নিজেদের দিকে টানতে চেয়েছে। বিজেপি সরকারের কৃষিনীতি জাঠ ভোটে ফাটল ধরিয়েছে। সেই ভোট এনডিএ-তে টেনে আনতে চরণ সিংয়ের নাতি রাষ্ট্রীয় লোকদলের নেতা জয়ন্ত চৌধরীকে এনডিএ-তে যোগ দেওয়ানোটা বিজেপির পক্ষে জরুরি ছিল। পুরস্কার ঘোষণার পরই জয়ন্ত চৌধরীর এনডিএ-তে যোগ দেওয়াতে খেতাবের পিছনের ছকটা স্পষ্ট হয়ে গেল।

আজ যখন দেশের, বিশেষত উত্তর ভারতের কৃষকরা নতুন করে এমএসপি সহ নানা দাবিতে আবার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন, কৃষি-বিজ্ঞানী এম এস স্বামীনাথনকে ভারতরত্ন দিতে সে সময়টিকেই বেছে নিল বিজেপি সরকার। কৃষিতে স্বামীনাথনের ভূমিকাকে সম্মান জানানোই যদি এই পুরস্কারের উদ্দেশ্য হত তবে দেশের পঞ্চাশ ভাগ মানুষ যে কৃষক সম্প্রদায়, যাদের কঠোর পরিশ্রমেই গোটা জাতির খাদ্যের জোগান অব্যাহত থাকে, তাদের জন্য কৃষির মোট খরচের দেড়গুণ হিসাবে ফসলের দাম নির্ধারণের যে সুপারিশ স্বামীনাথন করেছিলেন তাকে বিজেপি সরকার এ ভাবে অগ্রাহ্য করতে পারত না। পুরস্কার ঘোষণার পরেও স্বামীনাথনের কন্যা কৃষক আন্দোলনে বিজেপি সরকারের দমন-পীড়নের তীব্র নিন্দা করে বলেছেন, কৃষকদের প্রতি সরকার অপরাধীর মতো ব্যবহার করছে, যা উচিত নয়। কৃষকদের দাবি মেনে নেওয়াই স্বামীনাথনের প্রতি সরকারের উচিত সম্মানপ্রদর্শন হত বলে কৃষকদের মতো দেশের বাকি মানুষেরাও মনে করেন।

ভারতরত্নের এই পাইকারি হার দেখে রাজ ঠাকরে সঞ্জয় রাউতরা বাল ঠাকরেকে এবং মায়াবতী দলিত রাজনীতির সূচনাকার কাঁসিরামকে ভারতরত্ন দেওয়ার দাবি তুলেছেন। তা হলে আর নরেন্দ্র মোদি অমিত শাহরাই বা বাদ থেকে যান কেন! গুজরাট দাঙ্গা যদি এই দুজনের মুকুটের একটি উজ্জ্বল পালক হয় তবে হিন্দুত্ববাদী জিগির তোলার সাফল্য ছাড়াও আদানিদের হাতে সমস্ত রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও শিল্পকারখানা তুলে দেওয়ার যোগ্যতাও তো এই প্রতিযোগিতায় অন্য এক পালক হিসাবে বিবেচিত হতেই পারে। নরেন্দ্র মোদি গুজরাটে নিজের নামে স্টেডিয়ামের নামকরণ করেছেন। ভারতরত্নটিই বা কে কবে তাঁকে দেবে তেমন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উপর ফেলে রাখার কোনও মানে হয় কি!

দেশের সর্বোচ্চ সম্মান নিয়ে এই নোংরা খেলা দেখে অবশ্য সাধারণ মানুষ ধিক্কারই জানাচ্ছেন শাসকদের।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নিমতৌড়ি লোকাল কমিটির প্রবীণ সংগঠক কমরেড পতিতপাবন গাঁতাইত দীর্ঘ রোগভোগের পর ৩০ জানুয়ারি ৮২ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি দলের আবেদনকারী সদস্য ছিলেন।

তাঁর পিতা কৃষ্ণ গাঁতাইত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কঙ্কনদিঘির জমিদারের নায়েব। প্রয়াত কমরেড রবীন মণ্ডল এবং পরবর্তীকালে প্রয়াত কমরেড ইয়াকুব পৈলানের সান্নিধ্যে তিনি নায়েবের কাজ ছেড়ে জমিদার-জোতদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের একজন সংগঠকে পরিণত হন। কৈশোরে পতিতপাবন গাঁতাইত কঙ্কনদিঘিতে যান এবং বাবার প্রভাবে সংগঠনে যুক্ত হয়ে ছাত্রদের সংগঠিত করেন। তিনি মথুরাপুর পঞ্চায়েত সমিতিতে তিনবার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি নিরপেক্ষ ভাবে দলমত বিচার না করে সকলকেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। পরবর্তীকালে পূর্ব মেদিনীপুরে স্থায়ী বসবাসকালে নিমতৌড়ি লোকালের কাজে যুক্ত হন। এলাকার আন্দোলন, বৃত্তি পরীক্ষা প্রভৃতি কাজে তিনি ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তিনবারের সভাপতি হয়েও পরবর্তী সময়ে নিশ্চিত পরাজয় জেনেও এলাকার পঞ্চায়েত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে তাঁর কোনও সমস্যা হয়নি। নিরহংকারী, শান্ত, সরল মনের মানুষটি বহু হাতছানিকে উপেক্ষা করে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত দলের আদর্শে অবিচল ছিলেন। গণদাবী পত্রিকা, দল প্রকাশিত বিভিন্ন বই সংগ্রহ করা ও পড়ার প্রতি তাঁর অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। বাড়িতে এলে কমরেডদের খাওয়া-দাওয়ার দিকে তিনি খুব নজর দিতেন। তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল এক দরদি মনের মানুষকে।

তাঁর বিপ্লবী স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১০ ফেব্রুয়ারি তাঁর বাড়িতে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড নন্দ পাত্র, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সূর্য জানা বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত ছিলেন উত্তর সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রণব মাইতি, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড চিন্ময় ঘোড়ই সহ এলাকার বহু কমরেড, পরিবারের সদস্য এবং শুভানুধ্যায়ী।

কমরেড পতিতপাবন গাঁতাইত লাল সেলাম

উত্তর ২৪ পরগণায় দলের ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার অন্তর্গত আগরপাড়া লোকাল কমিটির প্রবীণ আবেদনকারী সদস্য কমরেড দীপক সেন ৭৬ বছর বয়সে ২৭ জানুয়ারি আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তিনি স্পন্ডিলাইটিসে ভুগছিলেন। ২২ জানুয়ারি রাতে গ্যাস ওভেন জ্বালিয়ে গরম সেঁক নেওয়ার সময় হঠাৎ তাঁর জামায় আগুন লেগে শরীরের উপরদিকের অনেকটাই পুড়ে যায়। তাঁকে আর জি কর হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও জীবন রক্ষা করা যায়নি। কমরেড দীপক সেনের মৃত্যুতে এলাকায় পার্টিকর্মী সহ সাধারণ মানুষের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।

অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান কমরেড দীপক সেনকে অনাথ আশ্রমে থেকে লেখাপড়া শিখতে হয়। কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজে পড়াকালীন ১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলনের সময়ে তিনি দলের সাথে যুক্ত হন। উল্টোডাঙা এলাকায় কমরেডদের সঙ্গে পরিচয়ের মাধ্যমে কমরেড দীপক সেন দলের সাথে যুক্ত হন। পরবর্তী সময়ে তিনি বেলঘরিয়ায় টেক্সম্যাকো ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিতে চাকরি পান। কারখানায় শ্রমিকদের সমস্ত আন্দোলনে তিনি অংশ নিতেন এবং সংগ্রামী মানুষ হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। পার্টির মুখপত্র বাড়ি বাড়ি বিক্রি করায় তাঁর ক্লান্তি ছিল না। পরবর্তীকালে তিনি বেলঘরিয়ায় থাকতে শুরু করলে আগরপাড়া-বেলঘরিয়া লোকাল কমিটির সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করতে থাকেন। নিজের অসুস্থতার কথা, অসুবিধার কথা বলতে চাইতেন না। অসুস্থতার জন্য চলাফেরার অসুবিধা সত্ত্বেও সর্বদা হাসিমুখে থাকতেন। শিক্ষা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বৃত্তি পরীক্ষায় তিনি এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন।

কমরেড দীপক সেনের মৃত্যুতে দল একজন একনিষ্ঠ, প্রাণবন্ত, দরদি পার্টিকর্মীকে হারাল।

কমরেড দীপক সেন লাল সেলাম

রাষ্ট্র ও বিপ্লব (১৮)

ভি আই লেনিন

বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ও রুশ বিপ্লবের রূপকার কমরেড লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষ উপলক্ষে দলের পক্ষ থেকে বর্ষব্যাপী কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে ভি আই লেনিনের 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' রচনাটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে। অনুবাদ সংক্রান্ত যে কোনও মতামত সাদরে গৃহীত হবে। এ বার অষ্টাদশ কিস্তি।

সাম্যবাদী সমাজের প্রথম স্তর

'ক্রিটিক অব দ্য গোথা প্রোগ্রাম'-এ লাসালের চিন্তাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করার জন্য মার্ক্স বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। লাসালের চিন্তা হল, সমাজতন্ত্রে শ্রমিক তার শ্রমের ফসলের 'অখণ্ড অংশ' বা 'পুরোটাই' পেয়ে যাবে, তার কম পাবে না। মার্ক্স দেখিয়েছেন, সমাজের সমগ্র সামাজিক শ্রম থেকে একটা সংরক্ষিত তহবিল সরিয়ে রাখতে হবে। উৎপাদনের বিস্তার ঘটানো, ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির ক্ষয় পূরণ সহ নানা প্রয়োজন এই তহবিল পূরণ করবে। তারপর ভোগের উপকরণ থেকেও একটা অংশ সরিয়ে রাখতে হবে। এ দিয়ে প্রশাসন, স্কুল, হাসপাতাল, বয়স্কদের জন্য বাসগৃহ এবং এই ধরনের আরও অনেক কিছুর ব্যয় নির্বাহ হবে।

লাসালের ভাসা ভাসা, দুর্বোধ্য, মামুলি শব্দবন্ধের (শ্রমের উৎপাদিত দ্রব্যের সবটাই শ্রমিককে দিতে হবে) পরিবর্তে সমাজতান্ত্রিক সমাজ কীভাবে তার সমস্ত কাজকর্ম নির্বাহ করবে মার্ক্স তার একটা বাস্তব হিসাবনিকাশ করেছেন। যেখানে পুঁজিবাদ থাকবে না, সেই সমাজের জীবনধারার সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মার্ক্স বলেছেন ঃ "এখানে আমাদের আলোচনা করতে হবে এমন একটা সাম্যবাদী সমাজের কথা (ওয়ার্কার্স পার্টির কর্মসূচির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে), যে সাম্যবাদী সমাজ নিজের ভিত্তির উপর বিকশিত হয়নি। তা পুঁজিবাদী সমাজ থেকে সবে জন্মগ্রহণ করেছে। তাই অর্থনৈতিক, নৈতিক, মানসিক, সব দিক থেকেই তার সর্বাঙ্গে তার গর্ভধাত্রী পুরনো পুঁজিবাদী সমাজের থেকে পাওয়া জন্মচিহ্ন দেগে দেওয়া আছে।"

এই সাম্যবাদী সমাজকেই মার্ক্স 'প্রথম' বা নিম্নস্তরের সাম্যবাদী সমাজ বলে চিহ্নিত করেছেন। এই সমাজ সবে পুঁজিবাদের গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছে এবং সবদিক দিয়েই সে পুরনো সমাজের জন্মচিহ্ন বহন করছে।

এই সমাজে উৎপাদনের উপকরণ আর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। উৎপাদনের উপকরণগুলি তখন সমগ্র সমাজের সম্পত্তি। সমাজের প্রত্যেক সদস্য সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম দেবেন। এর বিনিময়ে তিনি সমাজ থেকে একটা সার্টিফিকেট পাবেন, তাতে বলা থাকবে তিনি এই পরিমাণ কাজ করেছেন। এই সার্টিফিকেট দেখিয়ে তিনি ভোগ্য বস্তুর সামাজিক ভাণ্ডার থেকে উপযুক্ত পরিমাণ ভোগ্য বস্তু পাবেন। সামাজিক তহবিলের জন্য শ্রমের পরিমাণের কিছুটা রেখে দেওয়ার পর, শ্রমিক সমাজকে যা দেয় সেই পরিমাণেই সে সমাজ থেকে তা ফিরে পায়।

একে 'সাম্যের' অপ্রতিহত রাজত্ব বলে মনে হতে পারে।

এই ধরনের সমাজের কথা মাথায় রেখে যখন লাসালে বলেন, (সাধারণভাবে এই সমাজকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ বলা হয়। কিন্তু মার্ক্স এর নামকরণ করেছেন, সাম্যবাদের প্রথম স্তর) এই হল 'ন্যায়সঙ্গত বণ্টন', এই হল 'সমাজের সমস্ত সদস্যের শ্রমের উৎপাদিত দ্রব্যের উপর সমানাধিকার', তখন তিনি ভুল করেন এবং মার্ক্স তাঁর এই ভ্রান্তি উদঘাটন করেন।

মার্ক্স বলছেন, এখানে 'সমানাধিকার' আছে ঠিকই, কিন্তু তা এখনও 'বুর্জোয়া অধিকার'। ধরেই নেওয়া যায়, অন্য সমস্ত অধিকারের মতো এই অধিকারের পিছনেও রয়েছে অসাম্য। সমস্ত অধিকারই হল, ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সব মানুষের উপর একই ব্যবস্থা প্রয়োগ করা। কিন্তু, সব মানুষ এক নয়, পরস্পরের সমানও নয়। তাই 'সমানাধিকার' বাস্তবে সাম্যের নীতিকে লঙ্ঘন করে এবং মানুষের উপর অবিচার করে। অবশ্যই, প্রতিটি মানুষ অপর একজনের মতো একই পরিমাণ সামাজিক শ্রম দিয়ে, সামাজিক উৎপাদনের থেকে সমান অংশ পাচ্ছে (উপরে যা বলা হয়েছে, সেই অংশটা বাদ দিয়ে)।

কিন্তু মানুষ তো সমান নয়। একজন বলবান, অন্যজন দুর্বল, একজন বিবাহিত, অন্যজন অবিবাহিত, একজনের অনেক সন্তান আছে, অন্য জনের সন্তান সংখ্যা কম। এই রকম অনেক পার্থক্য আছে। এজন্য মার্ক্স সিদ্ধান্ত করেছেন ঃ "যদি সবাই সমান শ্রম দেয় এবং সবাই যদি সমাজের ভোগের তহবিল থেকে সমান অংশ পায়, তবে বাস্তবে একজন আর একজনের থেকে বেশি পাবে, একজন অন্যজনের তুলনায় ধনী হবে, এবং এই ধরনের আরও পার্থক্য দেখা দেবে। এই ত্রুটিকে দূর করার জন্য অধিকার সমান হওয়ার পরিবর্তে অসমান হতে হবে।"

তাই, প্রথম পর্যায়ের সাম্যবাদ ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। সম্পদের পার্থক্য ও অন্যায্য পার্থক্য তখনও থাকবে। কিন্তু মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ অসম্ভব হয়ে পড়বে। কারণ, কারখানা, যন্ত্রপাতি, জমি ইত্যাদি উৎপাদনের উপকরণ কেউ দখল করে ব্যক্তি সম্পত্তিতে পরিণত করতে পারবে না। লাসালের পেটি বুর্জোয়া বিভ্রান্তিমূলক শব্দবন্ধ দিয়ে সাধারণভাবে বলা 'সাম্য' ও 'ন্যায়'-এর বক্তব্যকে খণ্ডন করতে গিয়ে মার্ক্স সাম্যবাদী সমাজের বিকাশের গতিপথ দেখিয়েছেন। এই সমাজ প্রথম যে 'অন্যায়'কে দূর করতে বাধ্য, তা হল, উৎপাদন উপকরণের উপর ব্যক্তিগত দখলদারি। কিন্তু 'যতটা শ্রম দিয়েছে সেই পরিমাণ অনুযায়ী ভোগ্য বস্তুর বণ্টনের (প্রয়োজন অনুযায়ী নয়) মধ্যে যে অন্যায় রয়েছে তাকে তখনই দূর করা যাবে না।

বুর্জোয়া পণ্ডিতরা, স্থূল অর্থনীতিবিদেরা, এদের মধ্যে 'আমাদের' তুগান বারানভস্কি আছেন, সবসময় এই বলে সমাজতন্ত্রীদের ভর্ৎসনা করছেন, মানুষ যে এক নয় এ কথা তোমরা ভুলে যাচ্ছ। আর ভুলে গিয়ে মানুষকে সমান করার 'স্বপ্ন' দেখছো। এই ধরনের ভর্ৎসনা দেখিয়ে দিচ্ছে, এই বুর্জোয়া পণ্ডিতরা কত অজ্ঞ।

মানুষ যে অবশ্যম্ভাবীরূপেই অসমান, সে কথা মার্ক্স অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিবেচনায় নিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি এই কথাও ভেবেছিলেন, উৎপাদন উপকরণকে সমগ্র সমাজের (সাধারণভাবে যাকে সমাজতন্ত্র বলা হয়) সম্পত্তিতে পরিণত করলেই বণ্টনের এই ত্রুটিকে দূর করা যাবে না। যতদিন পর্যন্ত 'যে পরিমাণ শ্রম দেওয়া হয়েছে, সেই অনুযায়ী' দ্রব্য বণ্টনের নীতি কার্যকর থাকবে, ততদিন 'বুর্জোয়া অধিকারের' অসাম্য থেকে যাবে।

মার্ক্স আরও বলেছেন ঃ "সাম্যবাদী সমাজের প্রথম স্তরে এই ত্রুটি থাকবেই। কারণ, পুঁজিবাদী সমাজের দীর্ঘদিনের প্রসব যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে সবে তার জন্ম হয়েছে। অধিকার কখনওই সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো এবং এই কাঠামোর দ্বারা নির্ধারিত সাংস্কৃতিক বিকাশকে ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না।"

সুতরাং, কমিউনিস্ট সমাজের প্রথম স্তরে (সাধারণত সমাজতন্ত্র বলা হয়) 'বুর্জোয়া অধিকার' সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় না, হয় অংশত। যতটুকু অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্পন্ন করা গেছে তার অনুপাতে তা লুপ্ত হয়। অর্থাৎ, উৎপাদনের উপকরণের সম্পর্কেই তা ঘটে। 'বুর্জোয়া অধিকার' উৎপাদনের উপায়কে ব্যক্তির নিজস্ব সম্পত্তি বলে মনে করে। সমাজতন্ত্র তাকে সাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত করে। সেই পর্যন্ত, এবং কেবলমাত্র সেই পর্যন্তই, 'বুর্জোয়া অধিকার' অবলুপ্ত হয়।

যাই হোক, এর দ্বিতীয় অংশটির নিরিখে কিন্তু বুর্জোয়া অধিকার থেকেই যাচ্ছে। সমাজের সকল সদস্যের মধ্য থেকে যাচ্ছে উৎপাদিত দ্রব্য বন্টন ও কাজের বিলি-বন্দোবস্তের নিয়ন্ত্রক (নির্ধারক শক্তি) ক্ষমতা হিসাবে। সমাজতান্ত্রিক নীতি হল ঃ 'যে কাজ করবে না, সে খাবার পাবে না।' এই নীতি ইতিমধ্যেই বাস্তবায়িত হয়েছে। অন্য সমাজতান্ত্রিক নীতি ঃ 'একই পরিমাণ শ্রমের জন্য একই পরিমাণ উৎপন্ন দ্রব্য', এই নীতিও ইতিমধ্যে কার্যকর হয়েছে। কিন্তু তা এখনও সাম্যবাদ নয়। যে 'বুর্জোয়া অধিকার' অসমান ব্যক্তিকে অসমান (বাস্তবেই অসমান) শ্রমের বিনিময়ে সমান উৎপাদিত দ্রব্য দেয়, এই ব্যবস্থা এখনও তা অবলুপ্ত করতে পারেনি।

মার্ক্স বলছেন, এটা 'ত্রুটিই'। কিন্তু সাম্যবাদী সমাজের প্রথম স্তরে এই ত্রুটি অনিবার্য। কারণ, কল্পনাবিলাস ছাড়া আমাদের এই চিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না যে, পুঁজিবাদ উচ্ছেদের সাথে সাথে কোনওরকম অধিকারের মানদণ্ড ছাড়াই জনগণ সমাজের জন্য কাজ করতে শিখে যাবে। তা ছাড়া বাস্তবিকই পুঁজিবাদ উচ্ছেদের সাথে সাথে এই ধরনের অর্থনৈতিক ভিত্তি তৈরি হয়ে যেতে পারে না এবং তখনও পর্যন্ত 'বুর্জোয়া অধিকার' ছাড়া অন্য কোনও মানদণ্ড নেই। তাই, এই পর্যন্ত রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা থাকবে। এই রাষ্ট্র উৎপাদন উপায়ের উপর সামাজিক মালিকানাকে রক্ষা করবে, শ্রমের সাম্য ও উৎপাদিত দ্রব্যের বণ্টনের সাম্যকে সুরক্ষা দেবে।

যখন কোনও পুঁজিপতি থাকবে না, যখন কোনও শ্রেণি থাকবে না, এবং সে জন্য, কোনও শ্রেণিকে দমনের প্রয়োজন হবে না, তখনই রাষ্ট্র অবলুপ্ত হবে।

কিন্তু এখনও রাষ্ট্র সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়নি। কারণ এখনও 'বুর্জোয়া অধিকার' সুরক্ষিত আছে। এই বুর্জোয়া অধিকার প্রকৃত অসাম্যকে পবিত্র বলে ঘোষণা করছে। রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ বিলীন করার জন্য পূর্ণ সাম্যবাদের প্রয়োজন। (চলবে)

শোকসংবাদ

উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় হাবড়া ব্লকে এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) দলের পূর্বতন আবেদনকারী সদস্য এবং আদিবাসী ও খেতমজুর আন্দোলনের সংগ্রামী সাথী কমরেড অনিল মালি ১৯ জানুয়ারি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ওই একই অঞ্চলে দলের পূর্বতন আবেদনকারী সদস্য ও কৃষক-খেতমজুর আন্দোলনের সংগ্রামী সাথী কমরেড বীরেন মালি মারা যান ২৬ জানুয়ারি।

প্রয়াত দুই কমরেডের স্মরণে গত ৮ ফেব্রুয়ারি একটি সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন বর্ষীয়ান কৃষক নেতা কমরেড হরিপদ মালি। সংগঠনের সূচনা লগ্নে কৃষক-খেতমজুর ও আদিবাসী আন্দোলনে প্রয়াত কমরেডদের বলিষ্ঠ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং এআইকেকেএমএসের রাজ্য সম্পাদক কমরেড গোপাল বিশ্বাস।

গণদাবী গ্রাহক হোন
• বার্ষিক - ১৫০ টাকা
• সডাক - ১৬৫ টাকা

সংক্ষেপে

জয়নগরে কীর্তন গায়কের উপর হামলার তীব্র নিন্দা

বিশিষ্ট কীর্তনীয়া দীনকৃষ্ণ ঠাকুর যিনি ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর গান ব্যবহার করতেন, দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগরে তাঁর উপরে সম্প্রতি হামলা চালায় উগ্র হিন্দুত্ববাদী আরএসএস-এর দুষ্কৃতীরা। এর তীব্র নিন্দা করে ১২ ফেব্রুয়ারি মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে প্রশাসনের কাছে হামলাকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে।

আইটি সেক্টরে ব্যাপক ছাঁটাই

গত এক বছরে ভারতের বিভিন্ন আইটি সেক্টরে ৭৫ হাজার কর্মী ছাঁটাই হয়েছে। দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী সরবরাহ সংস্থা ফেনো জানিয়েছে অক্টোবর-ডিসেম্বরে আটটি সংস্থায় কর্মী ছাঁটাই করেছে ১৭ হাজার ৫৩৪। কেন ছাঁটাই? কারণ আমেরিকা ও ইউরোপের ব্যবসায়িক সংস্থাগুলি এখন জরুরি খরচ ছাড়া অন্য কিছুতে ব্যয় করতে চাইছে না। রিসার্চ সংস্থা এভারেস্ট গ্রুপের অংশীদার যুগল যোশী জানিয়েছেন, একাধিক বড় আইটি সংস্থা ক্যাম্পাস প্লেসমেন্টের মাধ্যমে ২০২২ সালে বহু গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার নির্বাচন করার পরেও তাদের কাজে নিয়োগ করা হয়নি। (এই সময় ঃ ১৪.০২.'২৪)

নয়া 'সংরক্ষণ' আইন অরণ্য ধ্বংসের পরোয়ানা

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ফরেস্ট কনজার্ভেশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট কার্যকর হয়েছে ২০২৩-এর ১ ডিসেম্বর। ১৯৮০ সালের বন-সংরক্ষণ আইনে যে বনাঞ্চল ছিল সুরক্ষিত-সংরক্ষিত, নতুন আইনে সেই বনাঞ্চলকে অসংরক্ষিত ঘোষণা করে তা বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার সব বন্দোবস্তই পাকা করেছে সরকার। ভারতের ২৭.৬ শতাংশ বনভূমি সরকারি খাতায় নথিভুক্ত নয়, সুতরাং অসংরক্ষিত।

সুপ্রিম কোর্ট দুটি যুগান্তকারী রায়ে স্পষ্ট নির্দেশ দেয় সরকারি খাতায় নিবন্ধীকৃত নয় এমন বনাঞ্চলকে প্রতিটি রাজ্য সরকার সংরক্ষিত বনের স্বীকৃতি ও মর্যাদা দিতে বাধ্য এবং সংরক্ষণের যাবতীয় অনুশাসন নব্যস্বীকৃতি প্রাপ্ত জঙ্গলেও সমানভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু ২৮ বছর বাদেও তা হয়নি। ফলে এটা স্পষ্ট, কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার পুঁজিপতিদের হাতে বনাঞ্চল তুলে দিয়ে ভোটে তাদের মদত পেতে কত সক্রিয়। তাতে পরিবেশ বিপন্ন হলেও, সেখানকার মানুষ উচ্ছেদ হলেও এদের কিছু যায় আসে না। (এই সময় ঃ ১২.০২.'২৪)

শিলাবতী নদীর খনন শুরু করার দাবি ঘাটালে

হুগলির এক সভায় ১২ ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, আগামী তিন-চার বছরের মধ্যে রাজ্য সরকারই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ করবে। এ প্রসঙ্গে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক ও দেবাশীষ মাইতি বলেন, ১৭ জানুয়ারি এক চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করা হয়েছিল যে, রাজ্য সরকার সেচ দপ্তরের বরাদ্দ অর্থ থেকে আগামী বর্ষার পূর্বে অন্তত শিলাবতী নদীর নিম্নাংশ খনন করুক। সংগ্রাম কমিটির দাবি, অবিলম্বে এই কাজের জন্য ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হোক, যাতে আগামী বর্ষার আগে কাজ শুরু করা যায়।

সন্দেশখালির ঘটনার প্রতিবাদে
১৬ ফেব্রুয়ারি রাজ্য জুড়ে ধিক্কার দিবস

শিয়ালদা, কলকাতা

রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া

পলাশি, নদিয়া

মেদিনীপুর শহর, পশ্চিম মেদিনীপুর

চুঁচুড়া, হুগলি

শিলিগুড়ি, দার্জিলিং

বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগণা

করনদিঘি ব্লকে বিড়ি শ্রমিক সম্মেলন

বিড়ি শ্রমিকদের সরকারি ন্যূনতম মজুরি, সরকারি পরিচয়পত্র, বোনাস, পিএফ, পেনশন, বিড়ি শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্প চালু সহ ১১ দফা দাবিতে 'করনদিঘি বিড়ি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের' ডাকে ১৭ ফেব্রুয়ারি উত্তর দিনাজপুর জেলার গোপালপুরে করনদিঘি ব্লক বিড়ি শ্রমিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধন করেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির নেতা সনাতন দাস। বিড়ি-শ্রমিক প্রতিনিধি বৈজন্তী দাস ও সামিমা খাতুন, সুশান্ত সিংহ ও আমিরুল ইসলাম এবং সম্পাদক জাহিরুদ্দিন সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। প্রধান বক্তা ছিলেন বিড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার রাজ্য সম্পাদক কমরেড আনিসুল আম্বিয়া। তিনি বলেন, মালিক ও ঠিকাদার এবং সরকারের ত্রিমুখী শোষণে জর্জরিত পশ্চিমবঙ্গে ২৩ লক্ষ বিড়ি শ্রমিকের করুণ অবস্থা পরিবর্তনের জন্য ঐক্যবদ্ধ ও লাগাতার আন্দোলন ছাড়া অন্য কোনও রাস্তা নেই। শান্তিলাল সিংহকে সভাপতি, জাহিরুদ্দিনকে সম্পাদক, নুর মহম্মদকে কোষাধ্যক্ষ করে ৩৫ জনের নতুন কমিটি গঠিত হয়

সেমেস্টার পদ্ধতি সুসংহত জ্ঞানচর্চার বিরোধী—এআইডিএসও

আগামী শিক্ষাবর্ষে(২০২৫) উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে সেমেস্টার ব্যবস্থা চালু করার কথা বলেছেন শিক্ষামন্ত্রী। এর তীব্র বিরোধিতা করে ১৩ ফেব্রুয়ারি এআইডিএসও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি সারা রাজ্যে বিক্ষোভ দেখায় (ছবি ঃ কলকাতা)। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক

বিশ্বজিৎ রায় বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস মুখে বিজেপি সরকারের বিরোধিতা করলেও সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের সামগ্রিক পরিকল্পনা জাতীয় শিক্ষানীতি এ রাজ্যে কার্যকর করছে। সেই নীতি মেনেই রাজ্যের স্কুলে ধাপে ধাপে সেমেস্টার ব্যবস্থা চালুর পরিকল্পনা করছে তারা। তারা উচ্চ-মাধ্যমিকে বোর্ড পরীক্ষা তুলে দেওয়ার কথাও বলছে।

তিনি বলেন, ইতিমধ্যে এ রাজ্যে স্নাতক স্তরে সেমেস্টার চালু হওয়ার ফলে উচ্চশিক্ষায় সামগ্রিক ও সুসংহত জ্ঞানচর্চার পরিসর খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্লাসের সময় কমে আসায় অনেক ক্ষেত্রেই সিলেবাস শেষ হচ্ছে না, ঠিক সময়ে পরীক্ষার ফলও প্রকাশ হচ্ছে না। তাছাড়া সেমেস্টার ব্যবস্থা চালু হলে উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার খরচ বাড়বে। সেমেস্টার পিছু ফি বহুগুণ বাড়বে, যা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দেখা যাচ্ছে।

গুয়াহাটিতে এআইডিওয়াইও-র উদ্যোগে

উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় যুব কনভেনশন

সমস্ত সরকারি শূন্য পদে নিয়োগ, বিলগ্নিকরণ বন্ধ, ঠিকাভিত্তিক নিয়োগ বন্ধ করে স্থায়ী নিয়োগ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে কল-কারখানা স্থাপন, কর্মসংস্থানের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি ও কর্মসংস্থান না হওয়া পর্যন্ত উপযুক্ত বেকার ভাতা ইত্যাদি দাবিতে ১১ ফেব্রুয়ারি এআইডিওয়াইও-র সর্বভারতীয় কমিটির উদ্যোগে আসামে গুয়াহাটির লক্ষ্মীরাম বরুয়া সদনে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি এবং পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের দুই শতাধিক যুবক-যুবতীর উপস্থিতিতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় যুব কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।

কনভেনশনে উপস্থিত প্রতিনিধিরা

যৌথভাবে কনভেনশন পরিচালনা করেন সংগঠনের নেতা বিজিত কুমার সিংহ, মলয় পাল, সাইফুল ইসলাম ও ভবতোষ দে। জিতেন চলিহা এবং সহশিল্পীদের সমবেত সঙ্গীতের পর ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ কুলেন্দু পাঠক উদ্বোধনী ভাষণ দেন। এস ইউ সি আই (সি)-র পলিটবুরো সদস্য জননেতা অসিত ভট্টাচার্য ও মেঘালয়ের শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ওয়াল্ডেল পাসার পাঠানো লিখিত বক্তব্য পাঠ করা হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের আসাম রাজ্য কমিটির সম্পাদক চন্দ্রলেখা দাস (ছবি)। কাছাড় কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ অজয় রায় এবং এ আই ডি ওয়াই ও-র সর্বভারতীয় কমিটির সভাপতি নিরঞ্জন নস্কর সহ সংগঠনের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। বক্তারা উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির যুবসমাজকে জাতিগত বিদ্বেষ, মাদক দ্রব্য ইত্যাদির প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে উগ্র প্রাদেশিকতাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবাদের ঊর্ধ্বে উঠে যুবসমাজের মূল সমস্যা বেকারত্ব নিরসনে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও উন্নত নীতি-নৈতিকতার ভিত্তিতে যুব আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

অসাধারণ নজির রেখে শেষ ১৭তম লোকসভা

- ১৯৫২ সাল থেকে ধরলে এবারের লোকসভায় সবচেয়ে কম সংখ্যক অধিবেশন বসেছে।
- গোটা লোকসভা পর্বে কোনও ডেপুটি স্পিকারকে নির্বাচন করা হয়নি।
- গোটা পর্বে লোকসভায় দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী একটি প্রশ্নেরও উত্তর দেননি।
- রাজ্যসভায় বিরোধী সাংসদদের একটি নোটিসও আলোচনার জন্য গৃহীত হয়নি।
- লোকসভার ভিতরে ট্রেজারির এক সাংসদকে সাম্প্রদায়িক গালিগালাজে অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
- এই প্রথমবার লোকসভার ভিতরকার নিরাপত্তা ভঙ্গ হল।
- নিরাপত্তা ভঙ্গের ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা চাওয়ায় ১৪৬ জন বিরোধী সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়।
- বিরোধী সাংসদদের ৩০০টি প্রশ্ন বাতিল করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিক্ষোভ ফুলবাড়িতে

দার্জিলিং জেলায় অ্যাবেকার ফুলবাড়ি ও সন্ন্যাসীকাটা অঞ্চল কমিটির নেতৃত্বে বর্ধিত ফিক্সড ও মিনিমাম চার্জ প্রত্যাহার, স্মার্ট মিটার বাতিল সহ অন্যান্য দাবিতে ১৩ ফেব্রুয়ারি ফুলবাড়ি সেক্টর অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান তিন শতাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক। একটি বিক্ষোভ মিছিল হয়। সেক্টর অফিসের সামনে বিক্ষোভসভার পর হরিকিশোর রায় ও আব্দুল আজিজের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল ফুলবাড়ি গ্রুপ কাস্টমার কেয়ার সেন্টারের স্টেশন ম্যানেজারকে স্মারকলিপি দেন।

১২ ফেব্রুয়ারির কর্মসূচিতে পুলিশের দ্বারা নিগৃহীত এবং গ্রেফতার হওয়া স্কিম-কর্মীদের সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হবে আগামী সংখ্যায়

আশা, অঙ্গনওয়াড়ি ও পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়ন

ভয়কে জয় করে অঙ্গীকারে দৃঢ় কর্মীরা

স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত আশা-অঙ্গনওয়াড়ি ও পৌরস্বাস্থ্য কর্মীরা ১২ ফেব্রুয়ারি পুলিশের লাঠি, গ্রেপ্তার, মিথ্যা মামলা, হাজতবাস মোকাবিলা করে এবং ১৩ ফেব্রুয়ারি রাজ্যব্যাপী কর্মবিরতি পালন করে আন্দোলনের নয়া ইতিহাস তৈরি করেছেন।

হাওড়া

১২ ফেব্রুয়ারি এআইইউটিইউসি অনুমোদিত আশা, অঙ্গনওয়াড়ি ও পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের প্রায় ৫০০০ কর্মী ধর্মতলায় বিভিন্ন দাবি নিয়ে জমায়েত হন। তাদের ক্ষোভের কারণ, সদ্য পেশ হওয়া কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের বাজেটে আশা, অঙ্গনওয়াড়ি, মিড ডে মিল কর্মীদের জন্য কোনও বরাদ্দ না করা।

পশ্চিম মেদিনীপুর

আশা, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের বিভিন্ন সময়ে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ না করাটা এ রাজ্যের গ্রাম-শহরের প্রায় ৭০ হাজার আশাকর্মী এবং তিন লক্ষ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী-সহায়িকার প্রত্যাশাকে আঘাত করেছে। কোনও মোবাইল ফোন দেওয়া না হলেও মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন প্রশাসনিক মিটিংয়ে ঘোষণা করেছেন যে আশা এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের তিনি তা দিয়ে দিয়েছেন। গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টির মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজের অস্বাভাবিক কর্মভারে আশা-অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা দিনরাত খেটে মরছে। কাজের বেশিরভাগ সময় চলে যাচ্ছে দুয়ারে সরকার, ভোটের ডিউটি, জনসংযোগ ও পাড়ায় সমাধান, খেলা, মেলা, পরীক্ষার সেন্টারে ডিউটি সরকারি বিভিন্ন মিটিং, মুখ্যমন্ত্রীর জনসভায় যোগদান করে ভিড় বাড়ানো ও ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা থেকে শুরু করে সমস্ত ধরনের কাজে। রাজ্য সরকারের দেয় অতিরিক্ত কাজে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক থাকলেও তা কর্মীরা পায় না। সরকার আদৌ সেই টাকা দিয়েছে কি না বা দিলেও মাঝপথে কারা বেহাত করে দিল ইত্যাদি নিয়ে সরকারের কোনও হেলদোল নেই। কর্মীদের দীর্ঘদিনের দাবি— উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে মাসিক ভাতা বৃদ্ধি করা। সেটা করা হল না। এই বাজেট স্বাস্থ্য, পুষ্টির মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা ক্ষেত্রে কর্মীদের ন্যূনতম আর্থিক সমস্যার সমাধানও করল না। ফলে দীর্ঘ বঞ্চনা এবং ক্ষোভ ক্রমাগত ধূমায়িত হতে হতে ধৈর্যের বাঁধ অতিক্রম করেছে। বাধ্য হয়ে সেদিন ধর্মতলায় ধরনা ও পথ অবরোধ হয়েছে। সেদিন বহু টালবাহানার পরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য প্রতিনিধি দলের সাথে দেখা করলেও কোনও প্রতিশ্রুতি দেননি। প্রতিনিধিদল ফিরে আসার পর সরকার পুলিশ দিয়ে জোর করে আশা কর্মী ইউনিয়নের সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন, সভানেত্রী কৃষ্ণা প্রধান, পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদিকা কেকা পাল ও পৌলমী করঞ্জাই ও অন্যতম নেত্রী রুনা পুরকাইত, আইসিডিএসের রীতা মাইতি, তপতী ভট্টাচার্য সহ ৩০ জনকে গ্রেপ্তার করে। পরদিন পর্যন্ত লালবাজার লক-আপে আটকে রাখে এবং মিথ্যা কেস দেয়। অনেকে পুলিশের লাঠির আঘাতে গুরুতর আহত হন। অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন।

এর প্রতিবাদে পরদিনই ১৩ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের সর্বত্র অভূতপূর্ব কর্মবিরতি, প্রতিবাদ মিছিল ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়েছে। রাজ্য জুড়ে সমস্ত স্কিমে সার্বিক বনধ পালিত হয়। সরকার কর্মীদের গ্রেপ্তার করে আন্দোলন দমন করে ভয় পাইয়ে দিতে চেয়েছিল। তাদের এই ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করে দিয়েছে কর্মীরা। সমস্ত দপ্তরের সকল সহকর্মীর স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা এবং সহমর্মিতা আন্দোলনের পক্ষে প্রবল সমর্থন জুগিয়েছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

এ দিন কোচবিহার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, উত্তর ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলি, বীরভূম, বর্ধমান জেলার ব্লকে ব্লকে কর্মীরা কর্মবিরতি করে মিছিল করে ব্লক এবং জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিককে ডেপুটেশন দেন।

মেদিনীপুর স্টেশন থেকে প্রতিবাদ মিছিল শহর পরিক্রমা করে কালেক্টরেট গেটে রাজ্য বাজেটের প্রতিলিপি পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখায়। বেলদাতেও বিক্ষোভ মিছিল, অবরোধ, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রতিলিপিতে অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি কর্মসূচি পালিত হয়। হাওড়া জেলার আশা, অঙ্গনওয়াড়ি ও মিড ডে মিল কর্মীদের একটি বিক্ষোভ মিছিল উলুবেড়িয়া স্টেশন থেকে হাসপাতাল মোড়ে এসে অবরোধ করে।

দার্জিলিং

পাঠকের মতামত

ক্ষোভের মুখে মোনালিসাও

প্যারিসের লুভর মিউজিয়ামে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির বিখ্যাত মোনালিসা ছবিতে সম্প্রতি কুমড়োর স্যুপ ছুঁড়ে মেরেছেন দুই মহিলা। চিৎকার করে বলেছেন— 'কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ? শিল্প না স্বাস্থ্যকর ও সাশ্রয়ী খাবার? আমাদের কৃষি ব্যবস্থা অসুস্থ। কৃষকেরা কাজ করতে গিয়ে মারা যাচ্ছেন।'

একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে ফ্রান্সের সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদ জানাতে এই পথ বেছে নিয়েছিলেন তাঁরা। প্রথমবার এমন ঘটল তা নয়। গত কয়েক বছরে ইউরোপের বেশ কয়েকটি শহরে রেনেসাঁস আমলের বেশ কয়েকটি বিখ্যাত শিল্পকর্মে পচা আলু কিংবা টম্যাটো ছুঁড়ে বার বার প্রতিবাদ জানাতে দেখা গেছে মানুষকে।

এইসব ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ। বোঝা যায়, ভারতের মতো ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলিতেও সরকারের জনস্বার্থবিরোধী বিভিন্ন নীতির বিরুদ্ধে প্রবল ক্ষোভ জমা হচ্ছে সাধারণ মানুষের বুকে। রাষ্ট্রের শাসক পুঁজিমালিক ধনকুবেরদের মুনাফার স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে তাদের রাজনৈতিক ম্যানেজার সরকারগুলি খেটে-খাওয়া মানুষের উপর নিষ্পেষণ ক্রমেই আরও জোরদার করছে। শ্রমিক-কৃষক স্বার্থবিরোধী কালা-আইন চালু করছে একের পর এক। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান ক্রমাগত তলানিতে পৌঁছচ্ছে। এর বিরুদ্ধে মানুষের মতো করে বাঁচার দাবিতে ইউরোপের দেশে দেশে একের পর এক উত্তাল আন্দোলনে ফেটে পড়ছে মানুষ। রেনেসাঁসের অনবদ্য অবদান মোনালিসার অনিন্দ্যসুন্দর ছবিটিতে কুমড়োর স্যুপ ছুঁড়ে দিয়ে ওই দুই প্রতিবাদী তাই বিশ্ববাসীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, সামন্তী যুগের অবসান ঘটিয়ে 'সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা'-র যে স্লোগান দিয়ে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই স্লোগান আজ কোথায় হারিয়ে গেল? ধনবান আর সর্বস্বান্ত মানুষের চরম আর্থিক বৈষম্যে প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশই তো জর্জরিত! কোথায় আজ মানুষে-মানুষে মৈত্রী? কোথায়ই বা মানুষের মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার স্বাধীনতা ভোগ করতে পারছে সংখ্যাগরিষ্ঠ মেহনতি মানুষ? ওই দুই প্রতিবাদী হয়তো বলতে চেয়েছেন, দু'বেলা দু'মুঠো খাবার জোগাড় করতেই নাভিশ্বাস উঠছে যে বিপুল সংখ্যক মানুষের, মোনালিসার ছবির সৌন্দর্য উপভোগের সুযোগ কোথায় তাদের! যাবতীয় শিল্পকলা তো এখন মুষ্টিমেয় ধনবানের ভোগের বিষয়!

এই ঘটনা আবারও দেখিয়ে দেয়, ক্ষোভের পাহাড়ের উচ্চতা ক্রমাগত বাড়ছে মেহনতি বঞ্চিত মানুষের বুকে। তাদের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের অধিকার যতদিন না সুনিশ্চিত হয়, যতদিন না তাদের রুদ্ধ হয়ে থাকা সার্বিক বিকাশের রাস্তা খুলে যায়, ততদিন নানা পথে সেই ক্ষোভের আগুনের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকবে।

রাজীব সিকদার, কলকাতা

কেনা-বেচার বাজার

একের পাতার পর

নির্বাচন কমিশনকে বন্ড ক্রেতাদের তালিকা দেয়ও, এবং নির্বাচন কমিশন ৩১ মার্চের মধ্যে তা প্রকাশও করে দেয়, তাতে বড়জোর জানা যেতে পারে কার এই বন্ড কিনেছিল। কে কাকে দিয়েছ তা জানা কঠিন, কারণ রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে এর রেকর্ড রাখার বাধ্যবাধকতা নেই। তবু চেষ্টা করা যাক নির্বাচনী বন্ডে টাকা ঢেলেছে কারা তা আন্দাজ করতে। দেখা যাচ্ছে শুধু ২০২৪-এর জানুয়ারিতে ৫৭০ কোটি টাকা নির্বাচনী বন্ডে ঢালা হয়েছে। এর ৯৪.৪ শতাংশই ১ কোটি টাকা মূল্যের। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ নন, কর্পোরেট কোম্পানি এবং অতি ধনীরাই এতে টাকা ঢেলেছেন। তথ্য বলছে, বিজেপি সহ বেশিরভাগ বড় সংসদীয় রাজনৈতিক দলের আয়ের বেশিটাই এসেছে হয় নির্বাচনী বন্ড থেকে না হলে অন্যভাবে কর্পোরেট কোম্পানি বা ব্যক্তিগত বৃহৎ পরিমাণ ডোনেশন থেকে। সাধারণ মানুষের দেওয়া ছোট মূল্যের চাঁদা সেখানে নগণ্য। কোনও কোনও দলের ক্ষেত্রে নির্বাচনী বন্ড থেকে আয় মোট আয়ের ৬০ থেকে ৯০ শতাংশের বেশি। তার মধ্যে বিজেপি, তৃণমূল অনেকেই আছে। অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস (এডিআর)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ৬টি জাতীয় দলের নির্বাচনী বন্ডের আয় ২০১৭-১৮ থেকে ২০২২-এর মধ্যে বেড়েছে ৭৪৩ শতাংশ, অন্যান্য কর্পোরেট বা ব্যক্তিগত বড় ডোনেশন বেড়েছে ৪৮ শতাংশ। সব স্বীকৃত রাজ্য-দলগুলির সম্মিলিতভাবে নির্বাচনী বন্ড থেকে আয় বেড়েছে ১৪০২৬.৪ শতাংশ, কর্পোরেট এবং বড় চাঁদা বেড়েছে ৩৮৯ শতাংশ (এডিআর রিপোর্ট, ১৪.০৮.২০২৩)। তাহলে, নাম ধরে বলা না গেলেও কারা এত বিপুল টাকা বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলির পিছনে ঢেলেছে তা বুঝতে অসুবিধা হয় কি?

নির্বাচনী বন্ড সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরে বিজেপি নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদ দলের পক্ষ থেকে সংবাদমাধ্যমে দাবি করেছেন, এই বন্ড বাতিল হলে আবার ভোটে কালো টাকার রমরমা ফিরে আসবে। বাস্তবটা কি তাই? বিজেপি সরকার এই বন্ড চালুর কিছুদিন পরে কোম্পানি আইন সংশোধন করে কিছু বিধিনিষেধ তুলে নেয়। তাতে যে কোনও কালো টাকার মালিকও একটা ভুয়ো কোম্পানি খুলে ফেলে শাসকদলের তহবিলে বিনিয়োগ করার সুযোগ পায়। কালো টাকার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কী অপূর্ব নিদর্শন! আর বিজেপি যে রাজনৈতিক 'ওয়াশিং মেশিন' তা এই দলের কার্যকলাপে এখন চালু কথা। বিজেপি সহ অন্যান্য বৃহৎ সংসদীয় দলগুলো রাজ্যে রাজ্যে নির্বাচনে যে বিপুল টাকা ওড়ায় তা সাদা উৎস থেকে কতটা আসতে পারে? এই প্রসঙ্গে একটা পুরনো তথ্য একটু ঝালিয়ে নিতে ক্ষতি কী? নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর প্রজাতন্ত্র দিবসে সোনার সুতো দিয়ে সর্বাঙ্গে নিজের নাম লেখা ১০ লাখ টাকা দামের যে কোটটি পরেছিলেন তা নিলামে কিনতে যাঁরা ঝাঁপিয়েছিলেন, তাঁদের সকলের বিরুদ্ধে নানা আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ ছিল। এমনকি যিনি কিনতে সফল হয়েছিলেন, তিনিও তাই। এঁদের মতো অনেকেই কি বিজেপির তহবিলে শক্তি জোগাননি?

কেন এত গোপনীয়তা?

সরকার কোর্টে দাবি করেছিল, যারা রাজনৈতিক দলকে টাকা দিচ্ছে তাদের গোপনীয়তা বজায় রাখা প্রয়োজন স্বচ্ছতার জন্যই। তাদের পরিচয় জানার অধিকার ভোটারদের থাকতে পারে না। এ জন্যই নির্বাচনী বন্ড পুরোপুরি গোপন এমনকি তথ্যের অধিকার আইনের আওতার বাইরে। আদালতে প্রশ্ন উঠেছে, একজন সাধারণ মানুষ কোনও রাজনৈতিক দলের আদর্শকে ভালবাসলে যাতে চাঁদা দেওয়া থেকে শুরু করে রাজনৈতিক মত প্রকাশে বাধা না পান সেটা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু তার সাথে রাজনৈতিক তহবিলে বিপুল অঙ্কের টাকা ঢালা অতি ধনী বা কর্পোরেট কোম্পানির পরিচয় গোপন রাখার প্রশ্নটা কি এক? আদালতও বলেছে, কর্পোরেট কোম্পানি টাকা দেয় ব্যবসায়িক সুবিধার লক্ষ্যে। সরকার এবং রাষ্ট্রকে দিয়ে সেই সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাকেই এখন স্বচ্ছতা বলতে হবে! বিজেপি যদি এতই স্বচ্ছতার দাবিদার হয় তাহলে কারা তাদের টাকা দিয়ে সমর্থন জানালো তা নিজের সমর্থক এবং ভোটারদের জানাতে ভয় কেন?

প্রশ্ন আরও, নির্বাচনী বন্ডের সিংহভাগ সব সময় শাসক দলের কাছেই গেছে কেন? বিজেপি নেতারাই যুক্তি দিয়েছেন, এখন তাঁরা সরকারে আছেন বলেই বৃহৎ পুঁজির মালিকরা তাঁদের দলের পিছনে দেদার টাকা খরচ করতে রাজি, কংগ্রেস যখন দীর্ঘদিন সরকারে ছিল তারা এই বৃহৎ পুঁজি মালিকদের টাকা বেশি পেয়েছে। কেন এই মালিকরা শাসক দলগুলির পিছনে টাকা ঢালে, তা কি দেশের মানুষের অজানা?

স্মরণ করা যেতে পারে, কিছুদিন আগে শিল্পপতি গৌতম আদানি নিজ মুখেই বলেছিলেন কংগ্রেসের আমলে তাঁর সাথে কংগ্রেসের বিশেষ সম্পর্ক ছিল, বর্তমান আমলে বিজেপির সাথে ব্যাপারটা এমনই। আরও স্মরণ করা দরকার, কয়েক বছর আগে বিজেপি সরকারের তেলমন্ত্রী একটি আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, তেলের দাম নির্ধারণে কর্পোরেট মালিকদের মত নিয়েই তাঁরা পা ফেলেন। এ ছাড়া বৃহৎ পুঁজিপতিদের লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা ব্যাঙ্ক ঋণ মকুব করে দেওয়া, তাদের হাতে দেশের সম্পদ বেচে দেওয়া, তাদের স্বার্থে একের পর এক আইন দেখার পরেও এই মালিকরা কেন শাসকদলকে বেশি টাকা দেয় তা কি আরও স্পষ্ট করে বলার দরকার পড়ে?

এতে কার ক্ষতি?

গান্ধীজিকে লালা লাজপত রাই বলেছিলেন, কংগ্রেস যদি পুঁজিপতিদের থেকে টাকা নিয়ে চলে তাহলে কংগ্রেস রাজনীতিকে তারাই প্রভাবিত করবে। ফলে তা নেওয়া উচিত নয়। বলেছিলেন, আপনি দেশের সাধারণ মানুষের কাছে টাকা চান, তারাই তহবিল ভরে দেবে। গান্ধীজি তা শোনেননি। এখন কী দেখছি আমরা? গোটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটাই আজ প্রহসনে পরিণত হয়েছে। নির্বাচনে বিপুল খরচ করে রাজনৈতিক দলগুলি ভোট কেনে কখনও সরাসরি, না হলে পরোক্ষে। ইংল্যান্ডের মতো ভারতের নির্বাচনেও ফেসবুকের মালিক কোম্পানিকে টাকা দিয়ে শাসকদলের পক্ষে জনমত তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল মানুষ জানে। এখন বিজেপি, কংগ্রেস, তৃণমূল বা রাজ্যে রাজ্যে নানা দলের ঝান্ডা ধরে যারা মিটিং মিছিল করে তারা আদর্শের টানে আসে? এখন এইসব দলের বেশিরভাগ নিচুতলার কর্মী টাকার বিনিময়ে মজুরে পরিণত বাহিনী মাত্র। এর সাথে বিজেপির বিখ্যাত আইটি সেলের মিথ্যা প্রচারের বিপুল শক্তি, টিভি, খবরের কাগজের ঢাউস বিজ্ঞাপন, রাস্তা জুড়ে হোর্ডিং এ রকম কতকিছু। এমনকি দলের নীতি নির্ধারণও এখন আর দলের সাধারণ সদস্য তো বটেই নেতাদেরও ভাবার বিষয় নয়! শোনা যায় নানা 'ভোট কুশলী' কেম্পানির নাম। এ ছাড়া আছে নেতা কেনার জন্য টাকা ও সুবিধার থলি। এক একজন নেতা-মন্ত্রী যে দলের হয়ে জেতেন সে দলে কতদিন টিকবেন বলা মুশকিল। মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটকে এমন কেনা বেচার মাধ্যমে সরকার গড়ার খেলা কি মানুষ ভুলে যেতে পারে? এর সাথে যুক্ত আমলাদের ও পুলিশকে কেনা, নির্বাচন কমিশনের উপর প্রভাব বিস্তারের মেশিনারি। এর পরেও কিছু ভোট ম্যানেজ না হলে সরাসরি পেশি শক্তিক জোর দেখানোর জন্য অস্ত্রের সমারোহ। বুর্জোয়া পেটিবুর্জোয়া দলগুলির ভোট রাজনীতিতে সাধারণ মানুষের কার্যত নির্ণায়ক কোনও ভূমিকাই নেই। তাই তাদের ওপর দলগুলোর নির্ভরতাও নেই। মনে রাখা দরকার, বুর্জোয়া ব্যবস্থায় সমাজের সম্পদের ওপর পুঁজিপতি শ্রেণির মালিকানাই তাদের শক্তির উৎস। মহান লেনিন তাঁর 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' গ্রন্থে সর্বহারা শ্রেণির মহান শিক্ষক এঙ্গেলসকে উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন, 'একটা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে সম্পদ পরোক্ষভাবে কিন্তু নিশ্চিতরূপে তার শক্তি প্রয়োগ করে'। মহান শিক্ষক মার্ক্সের শিক্ষা তুলে ধরে লেনিন আরও দেখিয়েছেন, বুর্জোয়া ব্যবস্থায় নির্বাচন মানে, 'কয়েক বছর অন্তর শোষিত মানুষকে অনুমতি দেওয়া—শোষক শ্রেণির কোন কোন প্রতিনিধি সংসদে তাদের প্রতিনিধি হবে, তাদের নিপীড়ন করবে তা বেছে নেওয়ার।'

এই দলগুলো সকলেই পুঁজিপতি শ্রেণিরই সেবাদাস। তাদের ভরণপোষেণের দায়ও এই শ্রেণির হাতেই আছে। তাই এ রকম কোনও দল যখন কেন্দ্রে বা রাজ্যে বিরোধী আসনেও থাকে, তখনও পুঁজিপতি শ্রেণি তাদের পক্ষের রাজনীতিকে বাঁচিয়ে রাখতে কম বেশি টাকা জুগিয়ে চলে। দুঃখের হলেও সত্য, সিপিএমের মতো বামপন্থী বলে পরিচিত দল নির্বাচনী বন্ডে টাকা না নিলেও কর্পোরেট মালিকদের থেকে অন্যভাবে চাঁদা নিয়েছে। তা অবশ্যই এখন ক্ষমতায় থাকা দলগুলির তুলনায় অনেক কম। কিন্তু তাদের রাজনীতির মধ্যেই মিশে থাকা শ্রম-পুঁজির মধ্যেকার আপসের লাইন পুঁজিপতি শ্রেণির কাছে তাদের দর পুরোপুরি কমে যেতে দেয়নি। তাই জনসমর্থন হারালেও তাদের রাজনীতির স্রোতে ভাসিয়ে রাখার দায়িত্বটা শাসক শ্রেণিগতভাবে পুঁজিপতিরা, কর্পোরেট কোম্পানি থেকে শুরু করে তাদের মালিকানাধীন বৃহৎ সংবাদমাধ্যম অনুভব করে।

একটা দলের রাজনীতি কার স্বার্থে পরিচালিত তার ওপর নির্ভর করে কে তাকে টাকা দেবে। পুঁজিপতি শ্রেণির পক্ষের দল হলে তারা দেবে, সাধারণ মানুষের স্বার্থ নিয়ে লড়লে টাকা দেবে জনগণ। তাই দেখা যায় এস ইউ সি আই (সি) -র সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় রাস্তায় দাঁড়িয়ে কিংবা বাড়ির দরজায় দরজায় গিয়ে পাঁচ দশ টাকা চাঁদা জোগাড় করে এবং দলের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের দেওয়া চাঁদায়। এভাবে দল চালানোর ক্ষমতা বুর্জোয়া দলগুলির একেবারেই নেই। আর আজ বামপন্থী বলে পরিচিত অন্যগুলির ক্ষেত্রেও তা নিঃশেষিত।

কিন্তু মানুষকে বুঝতে হবে, ভোট রাজনীতির নামে এই জিনিস চলতে দিলে ক্ষতি তাদেরই। তাই নির্বাচনেও সমাজমুক্তির রাজনীতিটাকে ঠিক ভাবে চেনা দরকার। না হলে সর্বনাশ হবে খেটে খাওয়া মানুষেরই।

জাম্বিয়ায় তামা খনির শ্রমিকরা সাম্রাজ্যবাদী লুটেরাদের সহজ শিকার

সম্প্রতি জাম্বিয়ার চিঙ্গোলাতে এক খোলা-মুখ তামা-খনিতে কাজ করার সময় প্রবল বৃষ্টি এবং ধসে মারা গেছেন ৭ জন শ্রমিক, নিখোঁজ আরও ২০ জন। আশঙ্কা, নিখোঁজ শ্রমিকরাও মারা গেছেন। কার্যত প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ছাড়াই শ্রমিকদের কাজে নামতে হয়েছিল বলে জানা গেছে।

আফ্রিকার দক্ষিণে ছোট দেশ জাম্বিয়াতে মাত্র ২০ কোটি মানুষের বাস। বিশ্বের মানচিত্রে দেশটি এক ক্ষুদ্র জায়গা নিয়ে রয়েছে। তা সত্ত্বেও এই দেশ বড় বড় পুঁজিপতি এবং সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে অত্যন্ত লোভনীয়। কারণ, বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম তামা উৎপাদনকারী দেশ জাম্বিয়া। বিশ্বের ৬ শতাংশ তামার উৎসস্থল এটি। ২০২২-এ বিশ্বে অষ্টম তামা-উৎপাদনকারী দেশ ছিল জাম্বিয়া। বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম তামা উৎপাদক কোম্পানিটি রয়েছে জাম্বিয়াতে। আরও বহু কোম্পানি রয়েছে সেখানে। ভারত, কানাডা ও চিনের বহুজাতিক কোম্পানিগুলির অংশীদারিত্ব বেশ ভাল পরিমাণ রয়েছে সেখানে। জাম্বিয়ায় তামা উৎপাদনে তালিকার শীর্ষে রয়েছে চিনের সিএনএমসি কোম্পানি।

খনিজ তামার সম্ভারে সমৃদ্ধ দেশ জাম্বিয়া। অথচ সেখানে অন্য শিল্প-কারখানা খুবই কম। দারিদ্র, অনাহার, বেকারি অত্যন্ত বেশি। অভাবের তাড়নায় ছাত্রদের স্কুলছুট স্বাভাবিক ঘটনা। শিশুমৃত্যু দেশের প্রধান সমস্যা। শিক্ষা ও চিকিৎসা ক্ষেত্র ধুঁকছে, ড্রাগে আসক্ত যুবসমাজ। ফলে যে কোনও মজুরিতে শ্রমিক পাওয়া সহজলভ্য। সে জন্য, এই তামার গায়ে লেগে আছে শ্রমিকের তাজা রক্ত। বর্তমানে বহু ক্ষেত্রে তামার ব্যবহার বাড়ছে ব্যাপক হারে। নির্মাণ শিল্প, ভোগ্যদ্রব্য, পরিবহন এবং শিল্প উৎপাদন ক্ষেত্রে তামা ব্যাপকহারে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়াও সোলার প্যানেল, বিদ্যুৎ চালিত গাড়িতে তামা ব্যবহৃত হয়, যেগুলি বর্তমানে বহুল প্রচলিত। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ভারতে তামা ব্যবহারের প্রয়োজন বেড়েছে ১৬ শতাংশ, ক্লিন এনার্জিতে বেড়েছে ৩২ শতাংশ। ওই সময়ে তামা উৎপাদনের মূল উপাদান কপার ক্যাথোডের আমদানি বেড়েছে ১৮০ শতাংশ। কেন্দ্রীয় সরকারের খনিমন্ত্রক সম্প্রতি তামা-সমৃদ্ধ জাম্বিয়াতে ব্যবসা সম্প্রসারণের উদ্দেশে এক প্রতিনিধিদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারতীয় বহুজাতিক কোম্পানি অনিল আগরওয়ালের বেদান্ত গোষ্ঠী তার সহায়ক গোষ্ঠী হিন্দুস্তান জিঙ্ক ও ওলা ইলেকট্রিকের সাথে যৌথভাবে জাম্বিয়াতে নতুন করে খননের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উল্লেখ্য, বেদান্তের ব্যবসায় কেন্দ্রীয় সরকারেরও কিছু অংশীদারিত্ব রয়েছে এবং আদানির মতো বেদান্তের ব্যবসা ফুলে-ফেঁপে ওঠার পেছনে মোদি সরকারের আর্শীবাদ রয়েছে। এ হেন বেদান্ত গোষ্ঠী কবজা করেছে জাম্বিয়ার কঙ্কোলা কপার খনি। জাম্বিয়ার তামার খনিতে চিনের সিএনএমসি এবং কানাডার ফার্স্ট কোয়ান্টাম মিনারেলস কোম্পানির বিপুল বিনিয়োগের সাথে পাল্লা দিয়ে ২০২৩-এ ভারতীয় বেদান্ত গোষ্ঠী ১.২ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে।

কোম্পানিগুলির এত বিপুল বিনিয়োগ সত্ত্বেও শ্রমিক নিরাপত্তার বেহাল অবস্থা কেন? কারণ সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির নিয়মেই একদিকে উৎপাদনের কারিগর শ্রমিকের শ্রমকে সম্পূর্ণ শুষে নিয়ে, তার প্রাপ্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করে, অন্যদিকে সরকারকে নামমাত্র রয়ালটি দিয়ে তামা তুলে দেশীয় ও বিশ্ববাজারে বিক্রি করে মুনাফার পাহাড় বানায় মালিকরা। পুঁজিমালিকদের স্বার্থ আর শ্রমিকদের স্বার্থ তাই সম্পূর্ণ বিপরীত। ফলে শ্রমিক-উন্নয়ন নিয়ে মাথাব্যথা নেই পুঁজিপতি শ্রেণির।

সেজন্য বিশ্বের প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশেই শ্রমিকদের একই অবস্থা— সে ভারতই হোক বা জাম্বিয়া।

লুটেরা সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে শ্রমিকদের প্রাপ্য এবং কাজের নিরাপত্তা আদায় করতে দরকার শ্রমিক আন্দোলনের জোয়ার। আন্দোলনের চাপে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে কোম্পানিগুলিকে বাধ্য করা। বিশ্বের দেশে দেশে শ্রমিকরা পথে নেমে বুর্জোয়া সরকারগুলির মালিকতোষণ নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। কিন্তু সঠিক তথা বিপ্লবী নেতৃত্ব ছাড়া সেই বিক্ষোভ বারেবারেই দিগভ্রষ্ট হবে। জাম্বিয়ার তামা-খনি শ্রমিকদেরও পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে যেমন ঐক্যবদ্ধ ভাবে আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে, তেমনই তাতে প্রতিষ্ঠা করতে হবে বিপ্লবী নেতৃত্ব।

কর্মরত শ্রমিক

বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশে নারী নিরাপত্তা বিপন্ন

উত্তরপ্রদেশে নারীরা কত নিরাপদ সে সম্পর্কে বিজেপি নেতাদের বক্তব্যই প্রথমে শোনা যাক। ২০২২ সালে এই রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের এক সমাবেশে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, রাত বারোটার সময় ষোলো বছরের কোনও তরুণী গয়না পরে নির্ভয়ে ঘোরাঘুরি করতে পারে। আইনশৃঙ্খলার এই উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে ২০১৭ সালে রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর।

রাজ্যের বাহরাইচে ২০২২ সালেই আরেকটি নির্বাচনী সভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এমনভাবে প্রশাসন পরিচালনা করছেন যে, রাজ্যে টেলিস্কোপ দিয়েও কোনও বাহুবলী খুঁজে পাওয়া যাবে না, সর্বত্র দেখা যাবে কেবল বজরঙবলী।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ঢাক পিটিয়ে যে কথাগুলি বলেছেন, তার সাথে বাস্তবের মিল কতটুকু? দেখা যাক ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর তথ্য কী বলছে। ২০২২ সালে নারীদের উপর সংঘটিত ক্রাইম রেকর্ডে উত্তরপ্রদেশ এক নম্বরে। অপহরণ, ধর্ষণ, ধর্ষণ করে খুন, গণধর্ষণ— এইসব অপরাধে উত্তরপ্রদেশ দেশের মধ্যে শীর্ষস্থানে। ২০২০ সালে এই ধরনের অপরাধ নথিভুক্ত হয়েছে ৪৯ হাজার ৩৮৫টি, ২০২১ এ সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়ালো ৫৬ হাজার ৮৩। ২০২২ এ আরও বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৫ হাজার ৭৪৩টি।

এ তো গেল কেবল নথিভুক্ত ঘটনার সংখ্যা। এই ধরনের ঘটনা ভবিষ্যতের কথা ভেবে লজ্জায়, ভয়ে বহু মানুষ থানায় জানান না। আবার থানাও খুব চাপে না পড়লে সাধারণত নথিভুক্ত করতে চায় না। ফলে মহিলাদের উপর এই ধরনের অপরাধের সংখ্যা বাস্তবে অনেক বেশি। তা হলে কার কথা সত্য? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর, নাকি তাঁর সরকারের রেকর্ডরক্ষাকারী সংস্থার? দেখা যাক নাগরিক সমাজ কী বলছে। লখনৌ ইউনিভার্সিটির কার্যকরী উপাচার্য রূপরেখা ভার্মা ফ্রন্টলাইন পত্রিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, বিজেপি নেতারা দাবি করছেন রাজ্যে ক্রিমিনালরা সব ইঁদুরের গর্তে ঢুকে গেছে। কিন্তু বাস্তবটা তা নয়। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর যে পরিবর্তনটা হয়েছে তা হল নারীদের উপর সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে সরকার ও পুলিশের বিরুদ্ধে মুখ খোলা যাবে না, আন্দোলন করা যাবে না। তিনি বলেন গত ২৫-৩০ বছরে উত্তরপ্রদেশে মহিলারা পর্দার আড়াল থেকে কিছুটা বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা তৈরি হয়েছে তা হল মহিলাদের উপর যৌন অপরাধ বেড়েই চলেছে। খুন করা হচ্ছে নিষ্ঠুরভাবে, যা অতীতে এতটা ঘটত না।

বিজেপি-শাসিত এই রাজ্যে পুলিশের ভূমিকা কী? পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিস (পিইউসিএল) উত্তরপ্রদেশের এক্সিকিউটিভ সদস্য বিকাশ শাক্য ফ্রন্টলাইনকে জানান, অপহরণ, ধর্ষণ, গণধর্ষণ এই ধরনের ঘটনায় তদন্তের সময় নানা ভাবে চেষ্টা হয় নির্যাতিতাকে ভীত সন্ত্রস্ত করে দেওয়ার। সরকারি উকিল এবং পুলিশ নানা ভাবে চেষ্টা চালায় অপরাধীকে বাঁচানোর। এমনকি বিচারের পরও নির্যাতিতাকে হুমকি দেওয়া হয়।

২০১৭ তে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বিজেপির যোগী আদিত্যনাথ নারীদের উপর অত্যাচার খর্ব করার ঘোষণা দিয়ে অ্যান্টি রোমিও স্কোয়াড গঠন করেছিলেন। বাস্তবে এই রোমিওদের বেশিরভাগই শাসকদলের অনুগত। ফলে বিচার করবে কে? উত্তরপ্রদেশের শোনভদ্রে এমএলএ-এমপিদের অপরাধ বিচার করার একটি স্পেশাল কোর্ট আছে। এখানে ১,১৪১টি মামলা ঝুলছে, যা দেশের মধ্যে সর্বাধিক। মামলার বিচারে কোর্টের বিশেষ তৎপরতা নেই। এলাহাবাদ কোর্টের হস্তক্ষেপে কিছুদিন আগে এই কোর্ট একটু নড়েচড়ে বসে এবং ২০২৩ এর ডিসেম্বরে একটা রায় দেয়, যা বিজেপি সরকারকে চরম অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। রায়ে দেখা গেল, দুধির বিজেপি বিধায়ক রামদুলার গোন্ড ১৫ বছরের এক মেয়েকে ধর্ষণ ও গর্ভবতী করার অপরাধে ২৫ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। বিধানসভা থেকে তাঁর সদস্যপদ খারিজ হয়। কিন্তু বিজেপি তাঁর সদস্যপদ খারিজ করার পথে হাঁটেনি।

বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির আইআইটিতে কুড়ি বছরের এক ছাত্রী গণধর্ষণের শিকার হন। নির্যাতিতা পাঁচজনের নামে গণধর্ষণের অভিযোগ আনেন। তারা প্রত্যেকেই বিজেপি-আরএসএসের সঙ্গে যুক্ত। ফলে পুলিশ অপরাধের মাত্রা কম করে দেখাতে শ্লীলতাহানি হিসেবে অভিযোগ নথিভুক্ত করে। এর বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। অবশেষে পুলিশ গণধর্ষণের ধারা যুক্ত করতে বাধ্য হয়।

২০২৩-এর জুনে উত্তরপ্রদেশের বারাবাঁকি জেলায় ১৭ বছরের এক দলিত কন্যা আত্মহত্যা করে। অভিযোগ জানানোর পর পুলিশ ক্রিমিনালদের ধরার পরিবর্তে আপস-মীমাংসা করে নেওয়ার জন্য ধর্ষিতার পরিবারকে চাপ দেয়। পুলিশের কি এই ভূমিকা পালন করার কথা? এই কি প্রধানমন্ত্রীর 'বেটি বাঁচাও' ঘোষণার বাস্তব রূপ?

কী বলছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী? তিনি এই ঘটনার তিন মাসের মাথায় গোরখপুরের এক সভায় বলেন, রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় যদি কেউ মেয়েদের উত্ত্যক্ত করে, তাকে আমরা যমালয়ে পাঠাবো। কেউ আমাদের বাধা দিতে পারবে না। কি সাংঘাতিক হুংকার! কিন্তু জনগণ দেখতে পাচ্ছেন অপরাধীরা যমালয়ের পরিবর্তে শাসকদলের কার্যালয়েই নিরাপদে রয়েছেন।

তা হলে কী দেখা যাচ্ছে? বিজেপি-শাসিত উত্তরপ্রদেশে পুলিশ নিরপেক্ষ ভাবে নয়, শাসকদলের অপরাধীদের বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করে চলেছে। পুলিশ সব রাজ্যেই এ ভাবে শাসকদলের হয়েই কাজ করে। সিপিএম আমলে পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ যেভাবে দলদাসের ভূমিকা পালন করেছে, তৃণমূল আমলেও তাই চলছে। পুলিশকে খানিকটা নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে বাধ্য করতে হলে প্রয়োজন নাগরিক আন্দোলন, যে কথাটা এস ইউ সি আই(সি) বরাবরই বলে আসছে।

(তথ্যসূত্র ঃ ফ্রন্টলাইন, ২৬ জানুয়ারি, ২০২৪)

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

গণদাবী GANADABI Volume: 76, No.: 27 Bengali Weekly February 23, 2024 Kolkata Price: Rs. 3.00

কর্ণাটকে আশাকর্মীদের বিশাল সমাবেশ

সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি, পিএফ-ইএসআই-গ্র্যাচুয়িটি এবং ১৫ হাজার টাকা সাম্মানিক ভাতা সহ নানা দাবিতে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত আশাকর্মী ইউনিয়নের ডাকে ১৪ ফেব্রুয়ারি সারা রাজ্যের ২০ হাজার আশাকর্মী 'বিধানসভা চলো' অভিযান উপলক্ষে বাঙ্গালোরের ফ্রিডম পার্কের বিক্ষোভ সভায় সামিল হন

লেনিন মৃত্যুশতবর্ষ উপলক্ষে উত্তরপ্রদেশে সভা

সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান শিক্ষক কমরেড লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষ উপলক্ষে ১১ ফেব্রুয়ারি এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত এক সভায় বক্তব্য রাখেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড দ্বারিকানাথ রথ

যোগমায়া দেবী কলেজে টিএমসিপি দুষ্কৃতীদের হামলা

প্রতিবাদে ছাত্র বিক্ষোভ রাজ্য জুড়ে

কলকাতার যোগমায়া দেবী কলেজে ১৪ ফেব্রুয়ারি তৃণমূল ছাত্র পরিষদ আশ্রিত দুষ্কৃতীরা কলেজের ভেতরে চড়াও হয়ে এআইডিএসও-র ব্যানার ফেস্টুন ছিঁড়ে দেয়। তারা স্বরস্বতী পুজোর সজ্জা নষ্ট করতেও উদ্যত হয়। সাধারণ ছাত্রীরা এবং এআইডিএসও-র ছাত্রীকর্মীরা বাধা দিলে তাদের উপর অতর্কিতে হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। এই হিংস্র বাহিনী নির্লজ্জভাবে কলেজের অধ্যাপক ও কর্মচারীদের উপরেও ঝাঁপিয়ে পড়ে। আক্রান্ত হন কয়েক জন অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও শিক্ষাকর্মী। পুরুষ দুষ্কৃতীরা এআইডিএসও-র ছাত্রীকর্মীদের পোশাক ছিঁড়ে দিয়ে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। তাদের মোবাইল ফোন, ঘড়ি, ব্যাগ কেড়ে নিয়ে পালায়।

এই আক্রমণে এআইডিএসও কর্মী কলেজ-ছাত্রী পুতুল প্রধান, অদিতি হান্ডা, দীপ্তি জানা, সুপ্রীতি মাইতি, মনীষা প্রধান সহ বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হয়। পুলিশকে ফোন করা হলেও তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছতে গড়িমসি করে। দোষীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবিতে এআইডিএসও পরদিন হাজরা চত্বরে বিক্ষোভ দেখায় এবং ভবানীপুর থানায় ডেপুটেশন দেয় (ছবি)। রাজ্যের সমস্ত জেলাতেও বিক্ষোভ কর্মসূচি হয়।

সংগঠনের পক্ষ থেকে কলেজের ভিতরে বহিরাগত পুরুষদের যাতায়াত বন্ধ করা, ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং কলেজের গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবি জানানো হয়।

সন্দেশখালি ঃ সংহতি সভায় বিশিষ্ট নাগরিকরা

সন্দেশখালিতে শাহজাহান এবং তার শাগরেদদের সন্ত্রাস, তোলাবাজি, নারীনিগ্রহ সহ নানা কুকর্মের প্রতিবাদে এবং সেখানকার প্রতিবাদী নাগরিকদের পাশে থাকার অঙ্গীকার নিয়ে ১৫ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় রানুচ্ছায়া মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল সংহতি সভা। মানবাধিকার সংগঠন

সিপিডিআরএস সহ অধ্যাপক- আইনজীবী-চিকিৎসক সংগঠন, সামাজিক-সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগুলি এই সভায় মিলিত হয়। রাজ্যের বিশিষ্ট সমাজকর্মী, মানবাধিকার আন্দোলনের নেতৃত্ব, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মীরা সভায় বক্তব্য রাখেন। অধ্যাপক সুজাত ভদ্র, প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল বিমল চ্যাটার্জী, অধ্যাপিকা মিরাতুন নাহার, বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব কৌশিক সেন, সঙ্গীত শিল্পী পল্লব কীর্তনীয়া, ঋদ্ধি সেন, বিশিষ্ট সাংবাদিক দিলীপ চক্রবর্তী, বিশিষ্ট সাংবাদিক অর্ক ভাদুড়ি সহ প্রত্যেকেই তাঁদের বক্তব্যে সন্দেশখালি সহ রাজ্য জুড়ে বেড়ে চলা অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিবাদে দাঁড়ানোর, রাস্তায় নামার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সুজাত ভদ্র প্রস্তাব দেন, সন্দেশখালিতে গিয়ে গণশুনানি করা হোক। সভায় উপস্থিত সকলেই তা সমর্থন করেন।

বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব কৌশিক সেন বলেন, ক্ষমতার অলিন্দে থাকা রাজনীতিকদের চাপে নাগরিকদের প্রতিবাদ করার জায়গাটা ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছে। আমরা শিল্পী। তাই শিল্পের মাধ্যমে প্রতিবাদ করতে হয় আমাদের। বলেন, ছোটবেলায় বাবা-দাদাদের মুখে শুনেছি বরানগর, কাশীপুরে বহু বামপন্থী কর্মী কংগ্রেসের হাতে খুন হয়েছিল। তা হলে কোন মন্ত্রবলে কংগ্রেস সাংঘাতিক বন্ধু হয়ে গেল সিপিএমের? কোন কংগ্রেস? যারা এমার্জেন্সি, শিখ দাঙ্গার মতো ভয়াবহ ঘটনা ঘটিয়েছিল। তিনি বলেন, সন্দেশখালি নিয়ে যখন নাগরিকরা প্রতিবাদ করছেন, তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির ভয়ঙ্কর উক্তি— ওখানে 'হিন্দু' নারীদের উপর নির্যাতন করা হয়েছে। নারীর মর্যাদা, নারী নির্যাতন এই কথাগুলির গুরুত্ব তাদের কাছে নেই।

তৃণমূলের দিকে আঙুল তুলে তিনি বলেন, আপনি এবং আপনার শাগরেদরা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রাজ্যবাসীকে লড়তে দিচ্ছেন না। আপনারা চুরি-দুর্নীতি করে এবং দুষ্কৃতীরাজ কায়েম করে 'দায়িত্ব' নিয়ে এই আন্দোলনকে পিছিয়ে দিচ্ছেন। তিনি বলেন, আমৃত্যু আমি এই ভেবে গর্ব বোধ করব যে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনে আমি যুক্ত ছিলাম।

মিরাতুন নাহার বলেন, শাসকরা বিরোধীদের সঙ্গে কাদা ছোঁড়াছুড়ি করবে, আর বিরোধীরা শাসকের ত্রুটি ধরে রাজনৈতিক স্বার্থে কাজে লাগানোর চেষ্টা করবে, শুধু এই-ই চলবে, নাকি জনস্বার্থ নিয়ে দলগুলি ভাববে? ঋদ্ধি সেন বলেন, বহু অনুষ্ঠান-উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী যাচ্ছেন, কিন্তু সন্দেশখালিতে তিনি যেতে পারলেন না। দিলীপ চক্রবর্তী বলেন, আমরা সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলনে ছিলাম, এই আন্দোলনেও আছি।

সংযুক্ত কিসান মোর্চা এবং কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলির যৌথ উদ্যোগে ১৬ ফেব্রুয়ারি যে সারা ভারত শিল্প ধর্মঘট ও গ্রামীণ ভারত বনধের ডাক দেওয়া হয়েছিল, তার সমর্থনে ১৫ ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরার আগরতলায় ওরিয়েন্ট চৌমুহনীতে এআইকেকেএমএস সহ অন্যান্য সংগঠনের উদ্যোগে সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন এআইকেকেএমএস-এর ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদক সুব্রত চক্রবর্তী ও সভাপতি বিভুলাল দে প্রমুখ।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Printed & Published by him on behalf of SUCI (Communist), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 700 013 ■ Printed at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. ■ 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com